—আরে বাপ রে! দিদি যে একেবারে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আলি গো।

—তাই বটে। ফিরে গিয়ে আমাকে রাঁধতে হবে। কি বলছ, বল?

—ভাল কথাই বলছি ভাই; বলছি ঘরে টিন দিবি? সন্ধানে আমার সস্তায় টিন আছে!

—টিন?

—হ্যাঁ গো! একেবারে নতুন। কলওয়ালারা বেচবে, কিনবি? একেবারে নিশ্চিন্তি! দেখ্। গোটা চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা।

দুর্গা কয়েক মুহূর্ত ভাবিল। মনশ্চক্ষে দেখিল—তাহার ঘরের উপর টিনের আচ্ছাদন—রোদের ছটায় রুপার পাতের মত ঝকমক করিতেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—উঁহু! না।

—তুর টাকা না থাকে আমাকে ইবার পরে দিস। ছ'মাস, এক বছর পরে দিস।

দুর্গা হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু! ও বলদের নামে তুমি হাত ধোও, হাম্‌দু ভাই। ও আমি এখন দু'বছর বেচব না।—বলিয়া দেহের একটা দোলা দিয়া চলিয়া গেল।

আগুন লইয়া বাড়ী ফিরিয়া দুর্গা দেখিল—দড়িগাছাটা সেইখানেই পড়িয়া আছে, মা সেটা স্পর্শ করে নাই। উনানে আগুন দিয়া এখন সে পাতুর সঙ্গে বচসায় নিযুক্ত। বড় বড় দুই বোঝা তালপাতা উঠানে ফেলিয়া পাতু হাঁপাইতেছে এবং মায়ের দিকে ক্রুদ্ধ বাঘের মত চাহিয়া আছে। পাতুর বউ কাঠকুঠা কুড়াইয়া জড় করিতেছে, রান্না চড়াইবে।

দুর্গা বিনা ভূমিকায় বলিল,—বউ, রান্না আর করতে হবে না। আমিই রাঁধছি, একসঙ্গেই খাব সব।

পাতু দুর্গার দিকে চাহিয়া বলিল—দেখ দুগ্‌গা দেখ! মায়ের মুখ দেখ! যা মন চায় তাই বলছে! ভাল হবে না কিন্তুক!

—তা আমিই বা কি করব বল্? এতক্ষণ তো আমার সঙ্গেই লেগেছিল। মা যে! গভ্যে ধরেছে মাথা কিনেছে! তাড়িয়ে দিতেও নাই, খুন করতেও নাই—মারধোর করলেও পাপ।

—একশো বার। তোর কথায় কাটান্ নাই কিন্তুক, ই গাঁয়ে থাকব কি সুখে—তুই বল দেখি?

—সত্যিই তু উঠে যাবি নাকি? হ্যাঁ দাদা? ভিটে ছেড়ে উঠে যাবি?

পাতু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—তাতেই তো আবার

এই অবেলাতে তালপাতা কেটে আনলাম দুগগা! নইলে—জংসনে কলে কাম-কাজ, থাকবার ঘর সব ঠিক করে এসেছিলাম দুপুর বেলাতে।—

দু'হাত ছাদাছাদি করিয়া তাহারই মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পাতু মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল, ওঠ। ওই দেখ্ ক'খানা লম্বা বাঁশ রয়েছে আমার, ওই ক'খানা চাপিয়ে তালপাতা দিয়ে ঘরখানা ঢাক। পিতি-পুরুষের ভিটে ছেড়ে কেউ কখনও যায় নাকি? তুই চলে উঠ, আমি আর বউ দু'জনাতে তুলে দিচ্ছি সব।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাতু উঠিল। দুর্গা কাপড়ের আঁচল কোমরে আঁট-সাঁট করিয়া বাঁধিয়া বলিল, ওই গাঁদা সতীশ। সতীশ বাউড়ী রে! মিনসে জগন ডাক্তারকে বলছে—পাতু বায়েন বড় নোক, ব্যালেস্টার, উকীল! তা আমি বললাম—আহা, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! বলে—বড়-নোক; গা ছেড়ে উঠে চলে যাবে। ওরা যায় তো, তোদিগে ভিটে দানপত্তর নিখে দিয়ে যাবে! তোরা ভোগ করবি!

বিড়ালীর মত হৃষ্টপুষ্ট পাতুর বউটা খুব খাটিতে পারে, খাটো পায়ে দ্রুতগতিতে লাটিমের মত পাক দিয়ে ফেরে। সে ইহারই মধ্যে বাঁশগুলাকে টানিয়া আনিয়া উঠানে ফেলিয়াছে।

নয়

গোটা পাড়াটা পোড়াইয়া দিবা অভিপ্রায় শ্রীহরির ছিল না। কিন্তু যখন পুড়িয়া গেলই, তখন তাহাতেও কিছু শেষ আফসোস তাহার হইল না। পুড়িয়াছে বেশ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে এমন ধারার বিপর্যয় ঘটিলে তবে ছোটলোকের দল সায়েস্তা থাকে; ক্রমশঃ বেটাদের আস্পর্ধা বাড়িয়া চলিতেছিল। তাহার উপর দেবু ঘোষ ও জগন ডাক্তারের উস্কানিতে তাহারা লাই পাইতেছিল। হাতের মার কিছু হয় না, ভাতের মার—অর্থাৎ ভাতে বঞ্চিত করিতে পারিলেই মানুষ জব্দ হয়। বাঘ যে বাঘ, তাহাকে খাঁচায় পুরিয়া অনাহারে রাখিয়া মানুষ তাহাকে পোষ মানায়।

এ সব বিষয়ে তাহার গুরু ছিল দুর্গাপুরের স্বনামধন্য ত্রিপুরা সিং। দুর্গাপুর এখান হইতে ক্রোশ দশেক দূর। শ্রীহরির মাতামহের বাড়ী ওই দুর্গাপুর। তাহার মাতামহ ত্রিপুরা সিংয়ের চাষবাসের তদ্বিরকারক ছিল। বাল্যকালে শ্রীহরি মাতামহের ওখানে যখন যাইত, তখন সে ত্রিপুরা সিংকে দেখিয়াছে।

লম্বা চওড়া দশাশয়ী চেহারা। জাতিতে রজপুত। প্রথম বয়সে ত্রিপুরা সিং সামান্য ব্যক্তি ছিল, সম্পত্তি ছিল মাত্র কয়েক বিঘা জমি। সেই জমিতে সে পরিশ্রম করিত অসুরের মত। আর স্থানীয় জমিদারের বাড়ীতে লস্করীর কাজ করিত। আরও করিত তামাকের ব্যবসা। হাতে লাঠি ও মাথায় তামাকের বোঝা লইয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে ফেরি করিয়া বেড়াইত; ক্রমে সুরু করে মহাজনী। সেই মহাজনী হইতে প্রথমত বিশিষ্ট জোতদার, অবশেষে তাহার মনিব জমিদারের জমিদারির খানিকটা কিনিয়া ছোট-খাটো জমিদার পর্যন্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরা সিংয়ের দাড়ি ছিল বড় শখের দাড়ি, সেই দাড়িতে গালপাট্টা বাঁধিয়া গোঁফে পাক দিতে দিতে সে বলিত, শ্রীহরি নিজের কানে শুনিয়াছে,—সেই ছেলেবেলায়—'এহি গাঁও হমি তিন তিনবার পুড়াইয়েসি, তব না ই বেটালোগ হমাকে আমল দিল!'

হা-হা করিয়া হাসিয়া সিং বলিত—'এক এক দফে ঘর পুড়ল আর বেটা লোগ টাকা ধার নিল। যে বেটা প্রথম দফে কায়দা হইল নাই—সে দু' দফে হইল, দু' দফেও যারা আইল না তারা আইল তিন দফের দফে। পাঁওয়ের পর গড়িবে পড়ল।' এই সব কথা বলিতে তাহার এতটুকু দ্বিধা হইত না। বলিত—বড় বড় জমিদারের কুষ্ঠী-ঠিকুজী নিয়ে এস, দেখবে সবাই ওই ক'রেছে। আমার ঠাকুরদা ছিল রত্নগড়ের জমিদার বাড়ীর পোষা ডাকাত। বাবুদের ডাকাতি ছিল ব্যবসা। সীতানগরের চাটুজ্জে বাবুরা সে দিন পর্যন্ত ডাকাতির বামাল সামাল দিয়েছে।

সিং নিজে যে কথাগুলি বলে নাই অথবা সিংয়ের মুখ হইতে ইতিহাসের যে অংশ শুনিবার শ্রীহরির সুযোগ-সৌভাগ্য ঘটে নাই, সে অংশ শ্রীহরিকে শুনাইয়াছে তাহার মাতামহ। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ নিজের নাতিকে সেই সব অতীতের কথা বলিত। ত্রিপুরা সিংয়ের শক্তির কাহিনী, সে একেবারে রূপকথার মত;—ত্রিপুরা সিংয়ের জমির পাশেই ছিল সে গ্রামের বহুবল্লভ পালের একখানা আউয়ল জমি—মাত্র কাঠা-দশেক তাহার পরিমাণ। সিং ওই জমিটুকুর জন্য, একশো টাকা পর্যন্ত দাম দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বহুবল্লভের দুর্মতি ও অতিরিক্ত মায়া। সে কিছুতেই দেয় নাই! শেষ, বর্ষার সময় একদিন রাত্রে সিং নিজে একা কোদাল চালাইয়া দুইখানা জমিকে কাটিয়া আকারে-প্রকারে এমন এক অখণ্ড বস্তু করিয়া তুলিল যে, পরদিন বহুবল্লভ নিজেই ধরিতে পারিল না, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কোথায় কোন্‌খানে ছিল তাহার জমির সীমানার চারিটা কোণ। বহুবল্লভ মামলা

করিয়াছিল। কিন্তু মামলাতে বহুবল্লভ তো পরাজিত হইলই, উপরন্তু কয়েকদিন পর বহুবল্লভের তরুণী-পত্নী ঘাটে জল আনিতে গিয়া আর ফিরিল না। ঘাটের পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে কে বা কাহারা তাহাকে মুখে কাপড় বাঁধিয়া কাঁধে তুলিয়া লইয়া গেল।

বৃদ্ধ চুপি চুপি বলিত—মেয়েটা এখন বুড়ো হয়েছে, সিংজীর বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে। একটা নয়, এমন মেয়ে সিংজীর বাড়ীতে পাঁচ-সাতটা।

ত্রিপুরা সিংয়ের বিষয়বুদ্ধি, দূরদৃষ্টির বিষয়েও শ্রীহরির মাতামহের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। বলিত—সিংজী লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, কি বিষয়বুদ্ধি! জমিদারের বাড়ীতে লস্করীগিরি করতে করতেই বুঝেছিল—এ বাড়ীর আর প্রতুল নাই। লাটের খাজনা মহল থেকে আসে; কিন্তু খাজনা দাখিলের সময় আর টাকা থাকে না। সিংজী তখন নিজে টাকা ধার দিতে লাগল। যখন যা দরকার হয়েছে, 'না' বলে নাই, নিজের কাছে না থাকলে আট আনা সুদে কর্জ করে এনে একটাকা সুদে বাবুদিগে দিয়েছে। তারপর সুদে-আসলে ধার হাওনোট পালটে পালটে শেষ-মেশ যখন চেপে ধরলে টাকার লেগে, তখন বাবুদের জমিদারিই ঘরে ঢুকল। ক্ষ্যাণজন্মা লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ! বলিয়া সে তাহার মনিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিত।

শ্রীহরির বাপ ছিল কৃতী-চাষী। দৈহিক পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পতিত জমি ভাঙিয়া উৎকৃষ্ট জমি তৈয়ারী করিয়াছিল। শ্রম ও সঞ্চয় করিয়া বাড়ীর উঠানটি ধানের মরাইয়ে মরাইয়ে একটি মনোরম শ্রীভবনে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। বাপের মৃত্যুর পর শ্রীহরি যখন এই সম্পদ হাতে পাইল তখন তাহার মনে পড়িল মাতামহের স্বনামধন্ত মনিব ত্রিপুরা সিংকে। মনে মনে তাহাকেই আদর্শ করিয়া সে জীবন-পথে যাত্রা সুরু করিল।

পরিশ্রমে তাহার এতটুকু কার্পণ্য নাই; তাহার বিনিময়ে ফসলও হয় প্রচুর। সেই ফসল সে বাপের মত কেবল বাঁধিয়াই রাখে না, সুদে ধার দেয়। শতকরা পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ পর্যন্ত সুদে ধানের কারবার। একমণ ধান ধার দিলে বৎসরান্তে একমণ দশসের বা দেড়মণ হইয়া সে ধান ফিরিয়া আসে। অবশ্য এটা শ্রীহরির জুলুম নয়। সুদের এই হারই দেশ-প্রচলিত। প্রচলনের অভ্যাসে খাতকও এ সুদকে অতিরিক্ত মনে করে না বরং অসময়ে অন্ন দেয় বলিয়া মহাজন তাহার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র।

শ্রীহরিকেও লোকে খাতির করে না এমন নয়; কিন্তু শ্রীহরি তাহা

পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করে না। সে অনুভব করে, লোকে ওই মৌখিক শ্রদ্ধার অন্তরালে তাহাকে ঈর্ষা করে, তাহার ধ্বংস কামনা করে। তাই এক এক সময় তাহার মনে হয়, সমস্ত গ্রামখানাতেই সে আগুন লাগাইয়া লোকগুলাকে সর্বহারা করিয়া দেয়।

পথ চলিতে চলিতে জগন ডাক্তারের মত এবং অনিরুদ্ধের মত শত্রুর ঘর নজরে আসিলেই বিদ্যুচ্চমকের মত তাহার ওই দুরন্ত অবাধ্য ইচ্ছাটা অন্তরে জাগিয়া উঠে। কিন্তু ত্রিপুরা সিংয়ের মত দুর্দান্ত সাহস তাহার নাই। সে আমলও যে আর নাই! ত্রিপুরা সিং যে ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিতে পারিত, আমলের চাপে শ্রীহরিকে সে ইচ্ছা দমন করিতে হয়। তা ছাড়া শ্রীহরির অন্যায়-বোধ—কালের পার্থক্যে ত্রিপুরা সিংয়ের চেয়ে কিছু বেশী।

এই অন্যায় বোধ ত্রিপুরা সিংয়ের চেয়ে তাহার বেশী বলিয়াই সে বারবার আপনার মনেই গত রাত্রের কাণ্ডটার জন্য নানা সাফাই গাহিতেছিল। বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে অকস্মাৎ উঠিল। ওই ভস্মীভূত পাড়াটার দিকেই সে চলিল। যাইতে যাইতেও বার কয়েক সে ফিরিল। কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। অবশেষে সে নিজের রাখালটার বাড়ীটাকেই একমাত্র গন্তব্য-স্থল স্থির করিয়া অগ্রসর হইল। তাহার বাড়ীর রাখাল, সে তাহার চাকর, এ বিপদে তাহার তল্লাস করা যে অবশ্য কর্তব্য। কার সাধ্য তাহাকে কিছু বলে, আপনার মনেই সে প্রকাশ্যভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যাও!

বোধ করি যে তাহাকে কিছু বলিবে—তাহাকে সে পূর্ব হইতেই ধমকটা দিয়া রাখিল। আসলে সে তাহার মনেই ওই অবাধ্য স্মৃতিউদ্ভূত সঙ্কোচকে একটা ধমক দিল।

রাখালটা মনিবকে যমের মত ভয় করে। ছিরু আসিয়া দাঁড়াইতেই সে ভাবিল আজিকার গরহাজিরের জন্যই পাল তাহার ঘাড়ে ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। ছেলেটা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ঘর পুড়ে গেইছে মশাই—তাতেই—

পুড়িয়া যাওয়ার পর এই গরীব পাড়াটার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া শ্রীহরি মনে মনে খানিকটা লজ্জাবোধ না করিয়া পারিল না। সে সস্নেহে ছেলেটাকে বলিল—তা কাঁদিস কেনে? দৈবের ওপর তো হাত নাই। কি করবি বল? কেউ তো আর লাগিয়ে দেয় নাই।

রাখালটার বাপ বলিল,—তা কে আর দেবে মশাই? কেনেই বা দেবে? আমরা কার কি করেছি বলেন যে ঘরে আগুন দেবে!